নিরক্ষরতার শৃঙ্খলে ২২% মানুষ ঝুঁকিতে ভাসমান শিশুর শিক্ষা

এম এইচ রবিন
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০০ এএম

রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনের পাশে ছোট্ট একটি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে প্রতিদিন যেত ময়না। রঙিন খাতায় নতুন বর্ণ লিখে তার চোখ জ্বলে উঠত আনন্দে। কিন্তু একদিন হঠাৎ পরিবার নিয়ে সে চলে গেল শহরের অন্য প্রান্তে- নতুন ফুটপাত, নতুন ঝুপড়িঘরে। শিক্ষক লিপি অনেক খুঁজেও আর ময়নাকে পাননি। এই ময়নাদের মতো হাজারো শিশু প্রতিনিয়ত ভাসমান জীবনে স্থান পরিবর্তন করছে, ফলে তাদের পাঠদান হয়ে উঠছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে অনেক দূর এগোলেও নিরক্ষরতার অন্ধকার এখনো কাটেনি। দেশের প্রতি পাঁচজনের একজন, অর্থাৎ ২২.১ শতাংশ মানুষ অক্ষরজ্ঞানহীন। ভাসমান শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে ধারাবাহিক উদ্যোগ না থাকায় নিরক্ষর জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাক্ষরতা শুধু শিক্ষা নয়, বরং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা ও ডিজিটাল ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য। মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় নাম লিখেছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে, প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের স্বপ্নও স্পষ্ট হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, দেশে মোট সাক্ষরতার হার ৭৭.৯ শতাংশ হলেও এই নিরক্ষর জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতির পথে বড় বাধা হয়ে আছে।

গত ডিসেম্বরেই শেষ হয়েছে আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম, যার মাধ্যমে ৮-১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ দিয়ে মূলধারায় আনা হচ্ছিল। এরপর থেকে নতুন কোনো উদ্যোগ নেয়নি সরকার। ফলে আবার ঝুঁকিতে পড়েছে বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুরা।

জাতীয় উন্নয়নে প্রভাব পড়ছে বলে মনে করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী। তিনি বলেন, ‘নিরক্ষর জনগণ আধুনিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। দক্ষতা ও জ্ঞান না থাকায় তারা সীমাবদ্ধ থাকে অদক্ষ, কম মজুরির কাজে। সামাজিক

দিক থেকেও অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষ স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রযুক্তি কিংবা নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না। প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে তারা ডিজিটাল বৈষম্যের শিকার হয়ে আরও প্রান্তিক হয়ে পড়ছে।'

সমাধানের পথ হিসেবে রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, 'টেকসই উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা কর্মসূচিকে প্রকল্পভিত্তিক না রেখে দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোয় আনতে হবে। বরাদ্দ বাড়াতে হবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায়, বাড়াতে হবে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সুযোগ। পাশাপাশি বেসরকারি খাত ও এনজিওকে কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।'

রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, 'আজকের বাংলাদেশে সাক্ষরতা কেবল শিক্ষা নয়, অর্থনৈতিক মুক্তি ও ডিজিটাল ভবিষ্যতের পূর্বশর্ত। কিন্তু ২২.১ শতাংশ নিরক্ষর জনগোষ্ঠী ও ভাসমান শিশুদের শিক্ষার টেকসই উদ্যোগ ছাড়া উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন পূর্ণতা পাবে না।'

এ প্রসঙ্গে সহমত পোষণ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার সতর্ক করে বলেন, নিরক্ষর জনগণকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর না করতে পারলে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে হোঁচট খাবে।

অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার জানান, সরকারের উদ্যোগ ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পে ৬৪ জেলায় ১৫-৪৫ বছর বয়সী প্রায় ৪৫ লাখ মানুষ মৌলিক সাক্ষরতা অর্জন করেছে। কক্সবাজারে ৬ হাজার ৮২৫ কিশোর-কিশোরীকে সাক্ষরতার পাশাপাশি কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে; তিন বছরে এ সংখ্যা ১ লাখে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে। এ ছাড়া প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্পে ৫ হাজার ১২০ শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে সাক্ষরতা ও ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা দেওয়া হচ্ছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র রাজধানীর ভিক্টোরিয়া পার্কে একদল শিক্ষক চটের ওপর বসে ভাসমান শিশুদের পড়াতেন। রুবি, সোনু আর রাশেদ একসঙ্গে পড়ে হাসিখুশি সময় কাটাত। কিন্তু দুই সপ্তাহ পর রুবি হারিয়ে গেল- ওদের পরিবার চলে গেছে সোয়ারীঘাট টাওয়ারের পেছনের ফাঁকা জায়গায়। আবার কিছুদিন পর সোনু নেই- গিয়েছে নদীর পাড়ে। কেন্দ্রের শিক্ষক শিহাব জানান, শিশুরা ভাসমান বলে স্কুলকেই ভাসমান হতে হবে, না হলে ধারাবাহিক শিক্ষা সম্ভব নয়।

শিক্ষা বিশ্লেষক ড. শাহনাজ আরা এ বিষয়ে বলেন, অক্ষরজ্ঞান দেওয়ার পাশাপাশি আয়মুখী দক্ষতা শেখাতে হবে। তবেই নিরক্ষর জনগণ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজে অবদান রাখতে পারবে। তিনি বলেন, জীবিকার তাগিদে শহরের ভাসমান পরিবারগুলো বারবার স্থানান্তর হচ্ছে। এই শিশুরা লেখাপড়ার পরিবর্তে কাজে যোগ দেওয়া বেশি প্রয়োজন মনে করে পরিবারের দরিদ্রতায়। ফলে শিক্ষায় ধরে রাখা যাচ্ছে না। অনেক এলাকায় কার্যক্রম টেকসই হচ্ছে না। এখন ডিজিটাল বৈষম্যে শহর-গ্রামের ব্যবধান নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে আরও পিছিয়ে দিচ্ছে।